দৈনিক খবর
87
তারিখ 26 NOV 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সন্ত্রাস বন্ধে ব্যর্থতা : দায়ী কে?

সেলিম রহমান

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠছে। ১৯৪৮ সালে পল্টন ময়দানে তৎকালীন পাকিস্তানী গভর্নর জেনারেলের সদম্ভ ঘোষণা 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'- এর প্রতিবাদে 'না না' ধ্বনি উঠে সেই জনসমুদ্র থেকে। পরবর্তী সময়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ছাত্ররা নেমে আসে রাজপথে। আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে আওয়াজ উঠে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। সেই যে ছাত্ররা পথে নেমে এলেন, তারপর সুস্থির হয়ে ক্লাসে ফেরা বুঝি তাদের আজো হলো না। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র মুসলিম লীগ বিরোধী আন্দোলন, '৬২-র মার্শাল ল' খেদাও আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, '৮২, '৮৭ ও '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে সফল নেতৃত্বদানকারী এই ছাত্রসমাজ আবার অশান্ত হয়ে উঠেছেন। '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী গণআন্দোলনে ছাত্রদের সফল নেতৃত্বদানের কথা জনগণ এখনও ভোলেনি। স্বৈরাচার হটিয়ে দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পরও কেন শিক্ষাঙ্গন অশান্ত থাকবে? শিক্ষাঙ্গনে কেন সন্ত্রাস আর অস্ত্রের মহড়া চলবে? ছাত্রদের যে হাতে শোভা পাওয়ার কথা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ সেই হাতে আজ দেখা যাচ্ছে পিস্তল, বন্দুক, কাটা রাইফেল, ককটেল ইত্যাকার মারণাস্ত্র। যে সময়ে ক্লাসে বা লাইব্রেরীতে তাদের পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা, সেই সময়টাতে এখন তারা ব্যস্ত প্রতিপক্ষকে ঠেঙানোর কাজে। দেশের কোন অভিভাবক তাদের সন্তানকে জ্ঞানার্জনের জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। সব সময় একটা ভয়ের মধ্যে থাকেন, এই বুঝি তার আদরের সন্তান লাশ হয়ে ফিরে এলো। সব সময় একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকেন। কিন্তু কেন?

প্রথমেই আসা যাক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে। কি চলছে সেখানে? এক সময়ের সবচাইতে শান্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত এই শিক্ষাঙ্গনটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে। সেখানে চলছে প্রগতিশীলদের সাথে প্রতিক্রিয়াশীলদের লড়াই। নির্ধারিত সময়ে শিক্ষাক্রম শেষ করার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সেশন জট ছিল না, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থায় সেশন জটের যাঁতাকলে পড়ে অনেক ছাত্র এখন শিক্ষাঙ্গন পরিবর্তনের চিন্তা করছেন। প্রকৃতপক্ষে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নিকট মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন 'ইসলামী ছাত্র শিবির'-এর চরম পরাজয়ের পর থেকেই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত ছাত্র সংগঠনটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছিল। এর সাথে মদদ যুগিয়েছে এক শ্রেণীর শিক্ষক সমাজ, যারা মনেপ্রাণে মৌলবাদী চিন্তাধারার বাহক। জামায়াতপন্থী উক্ত শিক্ষকদের সাথে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা-চেতনার অধিকারী এক শ্রেণীর মানুষ হাত মিলিয়েছে শিক্ষাঙ্গনের শান্ত স্থিতিবস্থা নষ্ট করে অরাজকতা কায়েমের কাজে। তারা বর্তমান উপাচার্য জনাব আলমগীর মোঃ সিরাজুদ্দিনকে অপসারণের জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমান উপাচার্য কার্যভার গ্রহণের পর ছাত্র-শিক্ষকদের কল্যাণে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যার মধ্যে ছিল নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে সন্ত্রাসহীন পরিবেশে চাকসুসহ সকল হলের নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে সুসম্পন্ন করা। স্বৈরাচারী শাসনামলে এ ধরনের একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, উক্ত নির্বাচনে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ভরাডুবি ঘটে। আর তখন থেকেই তারা বিভিন্নভাবে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনকে অশান্ত করে রাখার কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। সিনেট নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোটে নির্বাচিত বর্তমান উপাচার্যকে অপসারণ করে নিজেদের পছন্দের মানুষটিকে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত করতে পারলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার শোনা যাবে শিবিরের রণধ্বনি, জয় হবে মৌলবাদী শক্তির। স্বাধীনতার পক্ষের প্রগতিশীল শক্তির ঘটবে পরাজয়, যা আমাদের কারোরই কাম্য নয়। কিন্তু বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনে সরকার বা প্রশাসনের কোন মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে থাকছে মাসের পর মাস। শিক্ষাজীবনের বারটা বেজে যাচ্ছে।

একই অবস্থা বিরাজ করছে রাজধানীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অঙ্গনে। ছাত্র ভর্তির ফরম বিতরণকে কেন্দ্র করে দুইদল ছাত্রের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, গেরিলা কায়দায় গোলাগুলী। যার ফলশ্রুতিতে অকালে ঝরে গেল দু'টি তাজা প্রাণ। সেদিন গোলাগুলীর তোড়ে পুলিশ পর্যন্ত ছাত্রাবাসে ঢুকতে পারেনি। কিছুদিন বিরতির পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে উক্ত কলেজের ছাত্রাবাসে। ব্যবহৃত হয় আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন ধরনের মারণাস্ত্র। প্রশ্ন হলো ছাত্রদের হাতে এসব মারণাস্ত্র আসছে কোথা থেকে? কারা তুলে দিচ্ছেন এসব মারণাস্ত্র ছাত্রদের হাতে? বিবেক নামের বস্তুটি কি তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও নেই? এ সকল অস্ত্রের ঘায়ে যারা মরছে তারা হতে পারতো ঐ সকল মানুষের ভাই, সন্তান, কিংবা কোন আপনজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও তথৈবচ। ক্লাসসমূহ চালু থাকলেও পরিস্থিতি থমথমে। একটি স্বাধীন দেশে গণআন্দোলনের ফসল গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পরও দেশের সর্ববৃহৎ শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি যদি এই হয়, তাহলে জাতির জন্য এর চাইতে লজ্জাজনক আর কিই বা হতে পারে? কিছুদিন আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াত নেতা মওলানা মতিউর রহমান নিজামী ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই মৌলবাদী সংগঠন এবং এর নেতা-কর্মীদের স্বাধীনতা বিরোধী ভূমিকার কথা জনগণ আজো ভোলেনি। ত্রিশ লাখ মানুষের মৃত্যু আর অসংখ্য মা-বোনের ইজ্জত লুন্ঠনের অপরাধে যারা অপরাধী তাদেরতো এদেশে রাজনীতি করার অধিকারই থাকার কথা নয়। বঙ্গবন্ধু এ সকল অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন নিজের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে। কিন্তু দেননি রাজনীতি করার অধিকার। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এ সকল অপরাধীকে রাজনীতিতে করেন পুনর্বাসিত। আমাদের রাজনীতিবিদরা বিভিন্ন সময়ে এদের পূর্বকৃত অপরাধের কথা ভুলে গেলেও সচেতন ছাত্র সমাজ ভুলতে পারেনি। আমরা চাই সম্পূর্ণ সন্ত্রাসমুক্ত সুস্থ শিক্ষাঙ্গন। আর এর দায়িত্ব অবশ্যই সকল রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সাথে সরকারকেই নিতে হবে। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত, অস্ত্রমুক্ত করার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সরকারের। আমরা আমাদের ভাই, বন্ধু, সন্তানদের জ্ঞানার্জনের জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে আতংকিত অবস্থায় প্রহর গুণতে পারি না। ছাত্রদের, জনগণের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের দায়-দায়িত্ব অবশ্যই সরকারের। মাত্র কয়েকদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনসমূহের লড়াইয়ে অকালে প্রাণ হারালেন ছাত্র নেতা মাহবুব। এর কয়েকদিন পরই দু'টি ছাত্র সংগঠনের গেরিলা কায়দায় বন্দুকযুদ্ধের মাঝে অসহায়ভাবে আটকে পড়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীসহ এলাকার জনগণ। সেদিন পুলিশকে হ্যান্ড মাইকের মাধ্যমে অস্ত্রধারীদের নিকট গোলাগুলী বন্ধের আবেদন জানাতে শোনা যায়। বেশ কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার পর কিছুদিন আগে খোলার সাথে সাথে জগন্নাথ হলে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে আবার থমথমে ভাব দেখা দেয়। কিছুদিন মোটামুটি শান্তভাবে চলার পর গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন আবার রণক্ষেত্রের রূপ নেয়। দুই ছাত্র সংগঠনের অস্ত্রধারী ক্যাডাররা পুনরায় প্রতিপক্ষের প্রাণ সংহারে মেতে উঠে। গেরিলা কায়দায় বন্দুকযুদ্ধে পিস্তল, রিভলভার, কাটা রাইফেল এমনকি আধুনিক চীনা রাইফেল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ ঘাস আবার রঞ্জিত হলো দুই তরুণের তাজা লাল রক্তে। সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে অকালেই ঝরে গেল দু'টি তাজা প্রাণ। পরবর্তী দৃশ্যতো অতিপরিচিত। শুরু হয় বহু অভিনীত নাটকের সেই দৃশ্য। একদিকে ছাত্র সংগঠনগুলো পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকে। কেউবা মৃতের রক্ত ছুঁয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নেয়। অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতারা শুরু করেন বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি দেয়া। নিন্দা জ্ঞাপন, ক্ষোভ প্রকাশের সেই পুরনো খেলা চলতে থাকে। মুখে 'সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন চাই' শ্লোগান দিলেও প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাস দমনে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছার অভাব আছে বলেই মনে হয়।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে রাজনৈতিক দলগুলোকে আন্তরিক হতে হবে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যদি তাদের ছাত্র ফোরামগুলোকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন তাহলে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। অস্ত্রমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার মূল দায়িত্ব বহন করতে হবে সরকারকেই। সাথে সাথে সকল রাজনৈতিক দলগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। ছাত্রদের হাতে এত অস্ত্র আসে কোথা থেকে? সন্ত্রাস করে কারা- তা আগে খুঁজে বের করে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী মহল যত প্রভাবশালীই হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে কেউ সন্ত্রাসীদের আর মদদ দিতে না পারেন।

সরকারী দলের কিংবা বিরোধীদলের যেই হোক না কেন, সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীর শাস্তির বিধান করতে হবে। তবেই কেবল সম্ভব শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা। 'ছাত্রানং অধ্যয়নং তপঃ' অর্থাৎ অধ্যয়নই ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা হওয়া উচিত। ছাত্ররা রাজনীতি অবশ্যই করবেন, তবে তা অবশ্যই হতে হবে সন্ত্রাসবিহীন পরিবেশে। সেই রাজনীতি হবে সুস্থ, সুন্দর, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি। কাউকে ক্ষমতায় বসানো বা কারও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ছাত্র সমাজকে ব্যবহার করা যাবে না। গুটিকয়েক সন্ত্রাসীর কারণে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি। সন্ত্রাসের কারণে বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় অনিয়মিত ক্লাস, নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় সেশন জটের ফলে ছাত্ররা স্বাভাবিক সময়ে তাদের শিক্ষা জীবন শেষ করতে পারছেন না। ফলস্বরূপ ছাত্রাবস্থাতেই চাকরির বয়স হারিয়ে সৃষ্টি করছেন আরেক ধরনের সামাজিক সমস্যা। বেকারত্বের চাপে হতাশাগ্রস্ত যুব সমাজ ধীরে ধীরে বিপথগামী হতে শুরু করে। সন্ত্রাসের কারণে দেশের আটটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ একশ' বাটটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে আছে। প্রতিনিয়তই সন্ত্রাস ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশের সর্বত্র। কিন্তু সন্ত্রাস দমনে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে না। এতে করে আমরা কি ভেবে নিতে পারি না যে, সরকার পরোক্ষভাবে শিক্ষাঙ্গনে অরাজকতা টিকিয়ে রাখছেন? যদি তাই হয়, তাহলে আমরা স্বৈরাচারী সরকারের আমল থেকে খুব একটা ভাল অবস্থায় আছি বলে মনে হয় না। ছাত্রদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাদের ওপর নির্ভর করছে জাতির ভবিষ্যত। রাজনৈতিক দলগুলো দেশের স্বার্থে, জাতির স্বার্থে তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোকে ধ্বংসের পথ থেকে ফেরাবেন এটাই সকলে আশা করে। ছাত্র জীবনে রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করতে পারলে পরবর্তী সময়ে জাতীয় পর্যায়ে সংসদ সদস্য বা মন্ত্রী হওয়া যায় এই ধরনের ভাবনা ছাত্রদের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। সরকার ও প্রশাসনের পাশাপাশি সকল রাজনৈতিক দলকেও শিক্ষাঙ্গনে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে এনে সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হতে হবে। সকলেরই মনে রাখা উচিত জ্বলন্ত অঙ্গারকে মুঠোয় চেপে ধরে আগুন নিভানো যায় না। এতে বরং নিজের হাতই পুড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।